ইউরোপীয় ইউনিয়ন
নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন
বাংলাদেশ ২০২৬
চূড়ান্ত প্রতিবেদন
নির্বাহী সারসংক্ষেপ এবং সুপারিশমালা
EU EOM বাংলাদেশ ২০২৬

সংসদীয় নির্বাচন, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনানুষ্ঠানিক অনুবাদ

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০২৬ সালের সংসদীয় নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য ছিল ও তা দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক শাসন ও আইনের শাসন পুনর্বহালের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২০০৮ সালের পর এই প্রথম নির্বাচন সত্যিকার অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল এবং মৌলিক স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে সম্মান দেওয়া হয়েছে। তবে, কিছু বিক্ষিপ্ত, স্থানীয় রাজনৈতিক সহিংসতা এবং প্রায়শই বিভ্রান্তিকর অনলাইন বয়ানের মাধ্যমে উস্কে দেওয়া মব আক্রমণের অব্যাহত ভীতি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নারীদের জন্য সীমিত রাজনৈতিক সুযোগ তাদের সমান অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) অংশীজনদের আস্থা বজায় রেখে এবং নির্বাচনের সততা সমুন্নত রেখে স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে কাজ করেছে। সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, পরবর্তীতে স্বচ্ছভাবে ফলাফল বিন্যাসকরণ ও সংকলন প্রক্রিয়া এবং ফলাফলের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, কীভাবে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের নবায়নকে সামনে এগিয়ে নিতে পারে।

একটি নবায়িত আইনি কাঠামোর অধীনে নির্বাচন পরিচালিত হয়েছিল, যা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (আরপিও)-এর ২০২৫ সালের সংশোধনীগুলো অন্তর্ভুক্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে শক্তিশালী করেছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ জোরদার করার লক্ষ্যে আরো সংস্কারের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আইনি নির্বাচনী কাঠামোটি খণ্ডিত রয়ে গেছে, আইনি নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা হ্রাসকারী এবং সততা ও স্বচ্ছতা ক্ষুণ্ন করার ঝুঁকি তৈরিকারী ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করার পাশাপাশি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অযাচিতভাবে সীমাবদ্ধ করে এমন আইনগুলো সংশোধন বা বাতিল করার উদ্দেশ্যে যার সংশোধন প্রয়োজন।

ইসি নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা কার্যকরে অন্তর্বর্তী সরকার (আইজি) এবং অন্যান্য অংশীজন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে ও সমর্থন করেছে। ইসি গণমাধ্যমের প্রশ্নের দ্রুত জবাব দিয়ে, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য শেয়ার করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ বজায় রেখে স্বচ্ছতা ও সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছে। তবে, প্রচারণা সম্পর্কিত এর নতুন ও কঠোর বিধিগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়নি, যা কখনও পক্ষপাতিত্বের ধারণা সৃষ্টি করেছে এবং অসম প্রতিযোগিতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে,, যে ব্যাপারে দুটি প্রধান নির্বাচনী জোটসহ অনেক দল সরব ছিল। নির্বাচনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইস উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল।

নির্বাচনের দিনের প্রস্তুতি পেশাদারিত্বের সাথে ও সময়মতো সম্পন্ন হওয়ায় নির্বাচনের প্রতি আস্থা বেড়েছে। বিদেশে বসবাসকারী প্রায় ৭ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটারকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছিল; ৮ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটকর্মীর প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল; এবং নির্বাচনী সামগ্রী বিতরণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল। নির্বাচনের দিন, ভোটকর্মীরা দক্ষতার সাথে ভোটগ্রহণ পরিচালনা করেন, অন্যদিকে উভয় প্রধান দলের এজেন্টদের দৃঢ় উপস্থিতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করেছিল।

ভোট গণনা এবং ফলাফল বিন্যাসকরণ ও সংকলন প্রক্রিয়ার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হলেও নির্বাচনের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা যেত। কার্যকরী হওয়া সত্ত্বেও, ভোট গণনার সময় প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই সবসময় করা হয়নি। ফলাফল বিন্যাসকরণ ও সংকলন প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ছিল, দলীয় এজেন্টগণ প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে পারছিলেন এবং রিটার্নিং

অফিসাররা নিয়মিতভাবে নির্বাচনী এলাকার ফলাফলের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করছিলেন, যা এর নির্ভুলতার বিষয়ে জনগণের আস্থা তৈরি করেছিল। তথাপি, ইসির জাতীয় পর্যায়ে ফলাফল প্রকাশের ধীর ও অ্যানালগ পদ্ধতি জনসাধারণের কাছে নির্ভরযোগ্য নির্বাচনী তথ্যের প্রাপ্তিকে সীমিত করে রেখেছিল।

সামগ্রিক বিচারে সংসদীয় নির্বাচনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছে এবং ভোটারগণ অনেক রাজনৈতিক বিকল্প থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন; যা প্রার্থী নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা একটি শক্ত ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল । ইসি প্রার্থী মনোনয়ন সংক্রান্ত ৬৪৫টি আপিল দক্ষতার সাথে ও স্বচ্ছভাবে নিষ্পত্তি করেছে, যা প্রাথমিকভাবে বাতিল হওয়া আপিলকারীদের দুই-তৃতীয়াংশকে পুনর্বহাল করেছে এবং তাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারকে বহাল রেখেছে। ২৭৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ প্রায় ২,০০০ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ৫১টি দলের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটই ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রনেতারা অধিকাংশই হয় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অথবা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন, যা জামায়াতে ইসলামীর সাথে আসন ভাগাভাগির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

প্রচার-প্রচারণা ছিল প্রাণবন্ত এবং প্রার্থীরা সমাবেশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা গণসমাবেশ আয়োজন করেন, যেখানে সশরীরে লক্ষ লক্ষ এবং অনলাইনে আরও কোটি কোটি সমর্থক যোগ দেন। স্থানীয় পর্যায়ে, রাস্তাঘাটে প্রচারণার ব্যানারে ছেয়ে গিয়েছিল এবং মিছিল ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা প্রাধান্য পেয়েছিল, অন্যদিকে ডিজিটাল জগতে, দলীয় প্রভাবশালীরা বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে তরুণদের ভোটকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছিল, কথার লড়াই ততই তীব্র হচ্ছিল এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু নীতির জায়গাথেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত অপমান ও পারস্পরিক অসদাচরণের অভিযোগে পরিণত হচ্ছিল। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতার নেটওয়ার্ক এবং আর্থিক সামর্থ্যের ভিন্নতা নির্বাচনের মাঠের সমীকরণ নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে।

অনেক নির্বাচনী তদন্ত ও বিচার কমিটিই (Electoral Enquiry and Adjudication Committee, ইইএসি) সক্রিয় ছিল এবং প্রচারণার নিয়মকানুন সমুন্নত রাখতে সাধারণত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল; তবে আর্থিক ও লজিস্টিক সীমাবদ্ধতা আইন অমান্যের অভিযোগ তদন্তে তাদের কার্যকারিতা সীমিত করে রেখেছিল। ইইএসি কর্তৃক অভিযোগের দ্রুত সাড়াদান, সংক্ষিপ্ত বিচার পরিচালনা এবং এমনকি অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে ইইউ ইওএম অনেক প্রতিবেদন পেয়েছে।

যদিও নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ করা ছিল এবং নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিবেদন দাখিল ছিল বাধ্যতামূলক, তবে সীমিত তদারকি ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা বিদ্যমান আর্থিক বিধিবিধান পরিপালনের বিষয়টি যাচাই করার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। অধিকন্তু, নির্ধারিত ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা সাধারণভাবে অবাস্তব রকমের কম বলে বিবেচিত হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয়ের একটি সমন্বিত ও ডিজিটাল প্রতিবেদন ব্যবস্থা এবং বাধ্যতামূলক নিরীক্ষার অভাবে, স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হয়েছিল, যা অপেক্ষাকৃত ধনী প্রার্থীদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, এই নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের উপস্থিতি প্রায় ছিলই না, যা জাতীয় রাজনীতিতে সমতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে। প্রতিযোগীদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ ছিলেন নারী এবং মাত্র ৭ জন নারী নির্বাচিত হন (২৯৭ জনের মধ্যে ২.৪ শতাংশ)। বিএনপি ১০ জন প্রার্থী দিয়েছিল (যাদের মধ্যে ৬ জন নির্বাচিত হয়েছেন), অপরদিকে জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ৩০টি দলের কোনো নারী প্রার্থীই ছিল না, যা জুলাই জাতীয় সনদে আপাত প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও নারী প্রার্থীদের সমর্থন করার রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবকেই প্রমাণ

করে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের প্রান্তিকীকরণ নতুন সরকারের গঠনেও আরও প্রতিফলিত হয়েছিল, যেখানে ৪৯টি পদের মধ্যে মাত্র ৩টি নারীদের দেওয়া হয়েছিল। নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ছিল বৈষম্য, ডিজিটাল ও শারীরিক হয়রানি এবং চরিত্র হনন।

নির্বাচনের ঠিক আগে বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক সহিংসতা চরমে পৌঁছেছিল; তবে, ঘটনাগুলো স্থানীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল, যা কোনো সুসম্বদ্ধ ধরন দেখায়নি এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রচার প্রচারণা চলাকালীন, ইইউ ইওএম ২৭টি জেলায় শারীরিক সহিংসতা জড়িত এমন প্রায় ৫৬টি প্রচারণা-সম্পর্কিত ঘটনার প্রতিবেদন পেয়েছে এবং নিশ্চিত হয়েছে, যার ফলে কমপক্ষে ২০০ জন আহত হয়েছে। প্রচারণাকারীদের, বিশেষ করে নারীদের, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানি এবং সম্পত্তির ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবেদনও পাওয়া গেছে। অধিকাংশ ঘটনাই বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের মধ্যে হয়েছিল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিএনপির সাবেক সহযোগীরাও প্রায়শই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

৫ কোটি ৫৬ লক্ষ তরুণ ভোটারের সমর্থন আদায়ের ডিজিটাল লড়াইটিও ছিল তীব্র, যার ফলে শিষ্টাচারপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্কের সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। ইইউ ইওএম কমপক্ষে ২৩টি ভাইরাল অপতথ্যের ঘটনা শনাক্ত করেছে, যেগুলোর কারসাজিমূলক বিষয়বস্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেকটি কমপক্ষে দশ লক্ষ ভিউ অর্জন করেছে। নির্বাচনকে অবৈধ প্রমাণ করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল এবং সংখ্যালঘু ও নারী অধিকারকর্মীদের লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, দলীয় প্রভাব বিস্তারকারী এবং বিভ্রান্তিকর গণমাধ্যম অ্যাকাউন্ট, বাংলাদেশের বাইরের কিছু অ্যাকাউন্টসহ, ফেসবুক ও টিকটক ছিল অপতথ্য ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম।

জাতীয় পর্যায়ের তথ্য-যাচাই উদ্যোগগুলো ডিজিটাল অধিকারকর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে অপতথ্য মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো বিদ্বেষপূর্ণ ও মিথ্যা বিষয়বস্তু শনাক্ত করতে উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে এবং তথ্য যাচাইকারীরা ভুল হিসেবে প্রমাণিত খবরের বিষয়ে প্রচার বাড়াতে বিশ্বস্ত প্রচলিত গণমাধ্যমগুলোর সাথে সহযোগিতা করেছে। এমনকি ইসি ও আইজির প্রেস উইংও নিয়মিতভাবে বিশ্বাসযোগ্য ভুল প্রমাণের খবরগুলো প্রকাশ করেছে। তবে, জাতীয় প্রতিবেদনগুলোর প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ধীর ছিল এবং নির্বাচনকালীন সময়ে বৃহৎ পরিসরে ডিজিটাল তথ্যের শুদ্ধতা রক্ষায় তাদের প্রস্তুতিহীন বলে মনে হয়েছে।

বেশ কয়েকটি বেসরকারি গণমাধ্যম নির্বাচনের ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করলেও, সার্বিকভাবে, নিজের ওপর নিজে নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিষয়টি এখনও গভীরভাবে রয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষগুলোর অব্যাহত চাপ, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত সহিংসতা ও হয়রানির ঘটনার পাশাপাশি পুলিশী সুরক্ষার অপর্যাপ্ততা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করেছে এবং আরও আইনি ও কার্যনির্বাহী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। আশার কথা হলো, বেসরকারি সম্প্রচার মাধ্যমগুলো প্রার্থীদের নিয়ে টক শোর আয়োজন করেছিল, যেখানে প্রার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ তুলে ধরেছিলেন, যা ভোটারদের জেনে-বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল।

জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পুনরুজ্জীবিত নাগরিক পরিসরের উদ্ভব ঘটেছে, যেখানে অসংখ্য তৃণমূল সংগঠন নির্বাচন-সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রায়শই ইইউ এবং দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারদের সমর্থনে, সুশীল সমাজ সংস্থাগুলো (CSO) ভোটার তথ্য প্রচারণা চালিয়েছে, রাজনৈতিক সহিংসতা ও অপপ্রচারের ওপর নজরদারি করেছে, ডিজিটাল সাক্ষরতার ঘাটতি পূরণে কাজ করেছে এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে, যা স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার পক্ষে কথা

বলেছে। এই সংগঠনগুলোর অনেকের জন্যই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ একটি নতুন কার্যক্রম ছিল এবং ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোতে তাদের এই উৎসাহকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

তবে, নির্বাচনে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বর্তমান আইনে কিংবা জুলাই জাতীয় সনদে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ না থাকায় আদিবাসী সম্প্রদায় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি সম্মান পাওয়ার আশা ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়শই সম্মানের সাথে ও স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাননি, কারণ প্রায় অর্ধেক ভোটকেন্দ্রই চলাচলে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশযোগ্য ছিল না, আবার তাদের জন্য পোস্টাল ব্যালট বা অন্য কোনো উপায়ও উপলভ্য ছিল না।

সামগ্রিকভাবে, ২০২৬ সালের সংসদীয় নির্বাচন রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনের সর্বস্তরের নির্বাচনী অংশীজনদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি এক অটল অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছে। একই সাথে, এটি আরও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেছে, যার মূল লক্ষ্য হলো আইনি নিশ্চয়তা জোরদার করা, নির্বাচনী সততার সুরক্ষাব্যবস্থা উন্নত করা, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অগ্রগতি সাধন করা। ভবিষ্যৎ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ সমুন্নত রাখার জন্য ইইউ ইওএম **১৯টি সুপারিশ** প্রদান করেছে। তার মধ্যে **ছয়টি অগ্রাধিকারমূলক সুপারিশ রয়েছে:**

1. *সংসদীয় নির্বাচন পরিচালনাকারী আইনি কাঠামো সংশোধন করা, যাতে অসঙ্গতি ও ফাঁকফোকর দূর করা যায়, বিভাজন হ্রাস করা যায়, আইনি নিশ্চয়তা জোরদার করা যায় এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে আরও নিবিড় সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা যায়।*

2. *উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ভোট গণনার সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যেমন স্ক্রিনে ডেটা এন্ট্রি প্রদর্শন, এবং সম্পূর্ণ প্রাথমিক ও চূড়ান্ত নির্বাচনী ফলাফল অনলাইনেসহ দ্রুত প্রকাশ করা।*

3. *২০৩০ সালের মধ্যে সকল রাজনৈতিক দল যেন সকল অভ্যন্তরীণ দলীয় কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার লক্ষ্য অর্জন করে তা নিশ্চিত করার জন্য, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)-এর ধারা ৯০খ(১)(খ)(ii) বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে এটি সংশোধন করা; এবং জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলকে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে বাধ্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা।*

4. *তথ্যগত ও নির্বাচনী সততা রক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক আইনি বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ সংশোধন করে একটি অধিকতর নিরাপদ ও স্বচ্ছ ডিজিটাল জগতকে উৎসাহিত করা। বর্ণিত বাদ্ধবাধকতা সমূহ সুনির্দিষ্ট সহযোগিতা কাঠামো, নির্বাচন কেন্দ্রিক বিশেষ পদক্ষেপ, অ্যালগরিদমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং বিষয়বস্তু পরিমার্জন সংক্রান্ত নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।*

5. *নির্বাচনী প্রচারণার অর্থায়ন সংক্রান্ত বিধানগুলো পর্যালোচনা ও শক্তিশালী করা, যাতে ব্যয়ের সীমা ও প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতাগুলো বাস্তবসম্মত, প্রয়োগযোগ্য এবং কার্যকর যাচাই ও তদারকির আওতাধীন হয়। আরপিও প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি আদর্শ ফরম্যাটে নিরীক্ষিত নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে বাধ্য করতে পারে, প্রচারণা চলাকালীন ও তৎপরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সুস্পষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে।*

6. *বিদ্যমান অখণ্ড সুরক্ষাব্যবস্থা বজায় রেখে এবং অতিরিক্ত সুরক্ষাব্যবস্থা অন্বেষণ করার পাশাপাশি, বাংলাদেশে যেসব ভোটার নির্বাচনের দিনে সশরীরে ভোট দিতে অক্ষম, যেমন— গৃহে আবদ্ধ ভোটার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, অভিবাসী শ্রমিক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের যোগ্যতা সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনা করা। অন্যান্য শ্রেণির ভোটারদের ভোটাধিকার প্রদানের উপযোগী আগাম ভোটদানের মতো অতিরিক্ত ভোটদানের ব্যবস্থাও চালু করা যেতে পারে।*

ভূমিকা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন (ইওএম) মোতায়েন করেছে। ইইউ ইওএম ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৪ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত দেশটিতে উপস্থিত ছিল।

ইইউ ইওএম-এর নেতৃত্ব দেন প্রধান পর্যবেক্ষক ইভার্স ইজাবস, যিনি লাটভিয়া নিবাসী ইউরোপীয় সংসদের একজন সদস্য। ইইউ ইওএম গঠিত হয়েছিল ঢাকা-ভিত্তিক ১১ জন বিশেষজ্ঞের একটি মূল দল এবং ৫৬ জন দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষক নিয়ে, যাদেরকে ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলাতেই মোতায়েন করা হয়েছিল। নির্বাচনের দিন পর্যবেক্ষণের জন্য ৯০ জন স্বল্পমেয়াদী পর্যবেক্ষক এই মিশনে যোগ দেন এবং তারা ৬ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, ইইউ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কূটনৈতিক মিশন এবং কানাডা, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড থেকে স্থানীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩৫ জন স্বল্পমেয়াদী পর্যবেক্ষকও এই মিশনে যোগ দেন। ইউরোপীয় সংসদের (ইপি) সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদলকে এই মিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পুরো দলে, ইইউ ইওএম-এ সকল ইইউ সদস্য-রাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে এবং সুইজারল্যান্ড থেকে ২২৩ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ছিলেন।

মিশনটির ম্যান্ডেট ছিল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সকল দিক পর্যবেক্ষণ করা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহের পাশাপাশি জাতীয় আইন কতটুকু মেনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করা। ইইউ ইওএম তার অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তে স্বাধীন। মিশনটি একটি প্রতিষ্ঠিত, দীর্ঘমেয়াদী, দেশব্যাপী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে এবং ২০০5 সালের অক্টোবরে জাতিসংঘ (ইউএন)-এর তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত ও বর্তমানে ৫০টিরও বেশি সংস্থা কর্তৃক সমর্থিত “আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মূলনীতি সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র” মেনে চলেছে।

সুপারিশমালা

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
আইনি কাঠামো						
১		তুলনামূলকভাবে ব্যাপক এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও, আইনি কাঠামোটি একাধিক আইন ও বিধানে বিভক্ত, যেগুলো সময়ের সাথে সাথে ধাপে ধাপে সংশোধিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সংস্কার প্রচেষ্টাগুলো (…) একটি সমন্বিত আইনি রূপরেখা বা ক্রমবিন্যাস কাঠামো ছাড়াই সমান্তরালভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং এতে মূলত সেইসব ত্রুটি ও অস্পষ্টতাসমূহ নিরসনে ব্যর্থ হয়েছে, যা ২০২৬ সালের নির্বাচনের সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ করে দিয়েছিল, যেমন রিটার্নিং কর্মকর্তাদের (আরও) আদেশে ভোট পুনঃগণনার বিষয়ে বিস্তারিত নিয়মের অভাব, দ্বৈত নাগরিকত্ব ত্যাগের বিষয়টি কখন থেকে আইনত কার্যকর হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা, নির্বাচনী প্রচারণার অর্থায়নের স্বচ্ছতা সংক্রান্ত অপর্যাপ্ত বিধান এবং প্রার্থী অযোগ্য হওয়ার ভিত্তিসমূহ আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে পুরোপুরি	**অগ্রাধিকার** সংসদীয় নির্বাচন পরিচালনাকারী আইনি কাঠামো সংশোধন করা, যাতে অসঙ্গতি ও ফাঁকফোকর দূর করা যায়, বিভাজন হ্রাস করা যায়, আইনি নিশ্চয়তা জোরদার করা যায় এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে আরও নিবিড় সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা যায়।	জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২	সংসদ	**রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের এবং সরকারি পদ ধারণের অধিকার ও সুযোগ এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার** আইসিসিপিআর-এর ২৫ নং অনুচ্ছেদ: "*প্রত্যেক নাগরিকের… অযৌক্তিক বিধিনিষেধ ছাড়া… নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ও সুযোগ থাকবে*"। সিসিপিআর-এর জিসি ২০, অনুচ্ছেদ৪: "*২৫ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা সুরক্ষিত অধিকারসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেকোনো শর্ত বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিসঙ্গত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে হতে হবে*" এবং "*আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত নাগরিকদের এই অধিকারসমূহের প্রয়োগ স্থগিত বা বর্জন করা যাবে না।*"

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।				
নির্বাচনী প্রশাসন						
২		ইসি মূলত জেলা নির্বাহী প্রধান অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনারদের মধ্য থেকেই রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেছে, অন্যদিকে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ ছিলেন জ্যেষ্ঠ *উপজেলা* কর্মকর্তা, যারা সকলেই সরকারি চাকরিজীবী। অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দলীয় প্রকৃতি বিবেচনায় নিলেও, ইইউ ইওএম-এর সাথে আলাপকারী অনেকে এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের রয়েছে কি না। রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসির নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে, যা এমন কর্মকর্তাদের নিয়োগের সুযোগ দেয় যারা সাধারণত নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত, যেমন নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা বা বিচারপতিগণ। নির্বাচন সংস্কার কমিশন এবং জাতীয় নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮, ২০২৪) তদন্ত কমিশনও এই কর্মপন্থা গ্রহণের	ইসির বিধিমালায় রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের জন্য পক্ষপাতহীনতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা; এমন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ করা, যাদের পক্ষপাতহীনতা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা ও ভাবমূর্তি রয়েছে, যেমন নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও বিচারপতিগণ।	কোনো আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই	নির্বাচন কমিশন	**অধিকারসমূহ কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে** সিসিপিআর-এর জিসি ২৫, অনুচ্ছেদ ২০: *"নির্বাচনী প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান এবং তা যেন সুষ্ঠুভাবে, নিরপেক্ষভাবে ও অঙ্গীকারনামার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা উচিত।"* আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন (আইপিইউ), অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড বিষয়ক ঘোষণাপত্র, অনুচ্ছেদ ৪(১): *"ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন ও সুসংহতকরণ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যার মধ্যে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন বা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও অন্তর্ভুক্ত।"*

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		পরামর্শ দিয়েছিল।				
৩		পোস্টাল ভোটিং কার্যক্রমের সামগ্রিক সাফল্য, নির্বাচনের দিন নিজেদের নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে অক্ষম এমন অন্যান্য শ্রেণির ভোটারদের জন্য এই পদ্ধতিটি সম্প্রসারণ করার যুক্তিকে আরও জোরদার করেছে। একই সাথে, পোস্টাল ভোটিং-এর ক্ষেত্রেও অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ভোট দেওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়, যার মধ্যে রয়েছে সম্ভাব্য ভোট কেনাবেচা এবং অন্যান্য ধরনের অযাচিত প্রভাব। এই ঝুঁকিগুলো বর্তমান স্বচ্ছতা ও সততার সুরক্ষা কবচসমূহ - বিশেষ করে 'ভোটারের ঘোষণা' - অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে; সেই সাথে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ভোটারদের জন্য উপযুক্ত অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং আগাম ভোটদান বা ভ্রাম্যমাণ ভোটকেন্দ্রের মতো অন্যান্য ভোটদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।	**অগ্রাধিকার** বিদ্যমান অখণ্ডতা সুরক্ষাব্যবস্থা বজায় রেখে এবং অতিরিক্ত সুরক্ষাব্যবস্থা অন্বেষণ করার পাশাপাশি, বাংলাদেশে যেসব ভোটার নির্বাচনের দিনে সশরীরে ভোট দিতে অক্ষম, যেমন— গৃহে আবদ্ধ ভোটার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, অভিবাসী শ্রমিক এবং শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের যোগ্যতর পরিধি সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনা করা। অন্যান্য ভোটার শ্রেণিকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দিতে আগাম ভোটদানসহ অতিরিক্ত ভোটদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে।	জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর সংশোধনী এবং/অথবা নতুন আইন	সংসদ, নির্বাচন কমিশন	**অধিকারসমূহ কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে** সিসিপিআর-এর জিসি ২৫, অনুচ্ছেদ ১১: "*ভোট দেওয়ার অধিকারী সকল ব্যক্তি যেন তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।*"
৪		গণভোটের প্রচারণায় তরুণ ভোটার ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সকল ভোটারের মধ্যে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো ভালো উপলব্ধি গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এই	নির্বাচনী চক্রের মধ্যবর্তী সময়ে ভোটার ও নাগরিক শিক্ষা কর্মসূচিকে সমর্থন করা, যেখানে নির্বাচনী ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা	কোনো আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই	নির্বাচন কমিশন	**অধিকারসমূহ কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে** সিসিপিআর-এর জিসি ২৫, অনুচ্ছেদ

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		ধরনের কর্মসূচিগুলো নির্বাচনী চক্রের মধ্যবর্তী সময়েও চালানো উচিত এবং শিক্ষা- ও প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগ কাজে লাগানো উচিত। নাগরিক ও ভোটারদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো নির্বাচন কমিশনের সাথে অংশীদারিত্ব গঠনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে; অন্যদিকে ইসির নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের চলমান ভোটার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব রয়েছে।	এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর সাথে নির্বাচন কমিশনের অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা।			১১: “*একটি সচেতন জনগোষ্ঠীর দ্বারা অনুচ্ছেদ ২৫-এর অধিকারের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ভোটারদের শিক্ষা ও নিবন্ধন বিষয়ক প্রচার অপরিহার্য।*” আইপিইউ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড বিষয়ক ঘোষণাপত্র, অনুচ্ছেদ। ৪(১): “*রাষ্ট্রের উচিত [...] জনগণ যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং এর সাথে জড়িত বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা বা তাতে সহায়তা প্রদান করা।*
প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন						
৫		জেলা ও উপজেলা সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত ব্যাপক শর্তাবলি সহ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের অত্যধিক কঠোর নিয়মকানুন নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর জন্য জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করা কঠিন করে তোলে। এই নির্বাচনের আগে আবেদন বাতিলের উচ্চ হারেই এর প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আবেদনকারী ১৪৩টি দলের মধ্যে	রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্তাবলি পুনর্বিবেচনা করে ভৌগোলিক উপস্থিতি ও সদস্যসংখ্যা সংক্রান্ত মানদণ্ডের সীমা হ্রাস করা এবং একই সাথে ভিত্তিহীন নিবন্ধন রোধে যুক্তিসঙ্গত সুরক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখা।	জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইন, ২০২০ সংশোধন করা	সংসদ	**সংগঠনের স্বাধীনতা** আইসিসিপিআর, ধারা। ২২: “*এই [সংগঠন করার স্বাধীনতার] অধিকার প্রয়োগের উপর এমন কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না, যা [...] একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা বা জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা [...], জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতার সুরক্ষা অথবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতার সুরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয়।*”

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		মাত্র আটটি দল সময়মতো ইসিতে নিবন্ধিত হয়েছিল।				
৬		আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে তৃণমূল পর্যায় থেকে মনোনয়নের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রার্থী নির্বাচন নিশ্চিত করতে হয়; তবে এটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি এবং প্রায়শই দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী ও তরুণ/তরুণীদের সুযোগ সীমিত করে দিয়েছে। এটি অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রেখেছে। কিছু অসফল প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, যা মাঝে মাঝে প্রচারণা-সম্পর্কিত সহিংস ঘটনায় ভূমিকা রেখেছিল।	বিদ্যমান আইনের বিধান মেনে, দলের মাঠপর্যায়ের কর্মী, নারী ও তরুণ/তরুণীদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা।	কোনো আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই	রাজনৈতিক দলসমূহ, নির্বাচন কমিশন	**অধিকারসমূহ কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে** সিসিপিআর-এর জিসি ২৫, অনুচ্ছেদ ২০: *“একটি স্বাধীন নির্বাচনী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই [...] নির্বাচনী প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠিত আইন অনুযায়ী তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে [...] কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।”* সিসিপিআর-এর জিসি ৩১, অনুচ্ছেদ ৭: *“রাষ্ট্রপক্ষ তাদের আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য আইন প্রণয়নমূলক, বিচারিক, প্রশাসনিক, শিক্ষামূলক ও অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।”*
প্রচার প্রচারণার পরিবেশ						
৭		প্রচার প্রচারণার নিয়মকানুনগুলো অতিরিক্ত বিশদ, অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট এবং তাসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হতো না, যার ফলে কিছু কিছু অংশীজন প্রতিযোগীদের প্রতি সমান আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।	এমন একটি প্রচারণা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, যা সুস্পষ্ট, অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ পরিহার করে এবং পর্যাপ্ত উপকরণ-সম্পন্ন তদারকি সংস্থা দ্বারা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়।	জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণবিধি ২০২৫,	সংসদ, নির্বাচন কমিশন	**আইনের শাসন** আইসিসিপিআর, ধারা। ২২: "*আইনের দৃষ্টিতে সকল ব্যক্তি সমান এবং কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়াই আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী।*" সিসিপিআর-এর জিসি ২৫, অনুচ্ছেদ

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		অসংখ্য প্রতিযোগী প্রচারণার নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এই লঙ্ঘনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি, যা দায়মুক্তি ও পক্ষপাতিত্বের ধারণাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।		সংশোধন করা		২৫: *“একটি আইন অবশ্যই যথেষ্ট নির্ভুলতার সাথে প্রণয়ন করতে হবে, যাতে একজন ব্যক্তি তদনুসারে তার নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়”।*
প্রচারণার অর্থায়ন						
৮		আরপিও প্রতিযোগীদের আর্থিক বিবরণী জমা দেওয়ার আগে নিরীক্ষা করা বা ইসি কর্তৃক তা যাচাই করার কোনো বাধ্যবাধকতা রাখে না; কিংবা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে চিহ্নিত লঙ্ঘন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সহ পরিপালন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও অডিটের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করারও কোনো বাধ্যবাধকতা রাখে না। যদিও আরপিও-তে ইসি-র ওয়েবসাইটে আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের বিধান রয়েছে, তবে এতে কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি এবং প্রতিবেদনগুলোর কোনো মূল্যায়ন প্রকাশ করার জন্য ইসি-কে বাধ্য করা হয়নি।	**অগ্রাধিকার** নির্বাচনী প্রচারণার অর্থায়ন সংক্রান্ত বিধানগুলো পর্যালোচনা ও শক্তিশালী করা, যাতে ব্যয়ের সীমা ও প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতাগুলো বাস্তবসম্মত, প্রয়োগযোগ্য এবং কার্যকর যাচাই ও তদারকির আওতাধীন হয়। আরপিও প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি আদর্শ ফরম্যাটে নিরীক্ষিত নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে বাধ্য করতে পারে, প্রচারণা চলাকালীন ও তৎপরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে পদ্ধতিগত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারে	জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করা	সংসদ	**প্রকৃত নির্বাচন, যা ভোটারদের ইচ্ছার অবাধ প্রকাশকে প্রতিফলিত করে** **দুর্নীতি প্রতিরোধ/নির্বাচনী প্রচারণায় ন্যায্যতা** **স্বচ্ছতা** সিসিপিআর-এর জিসি ২৫, অনুচ্ছেদ ১৯: *"কোনো প্রার্থী বা দলের পক্ষে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যয়ের ফলে ভোটারদের অবাধ পছন্দ যাতে ক্ষুণ্ন না হয় বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিকৃত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন, সেখানে নির্বাচনী ব্যয়ের উপর যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা আরোপ করা সমীচীন হতে পারে।"* ইউএনসিএসি অনুচ্ছেদ ৭.৩: *"রাষ্ট্রের প্রতিটি পক্ষকে এই সমঝোতা বা*

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
			এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সুস্পষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে।			*কনভেনশনের উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং নিজ অভ্যন্তরীণ আইনের মৌলিক নীতিমালা অনুসারে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পদের প্রার্থীদের অর্থায়নে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়নে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিও বিবেচনা করবে।"*
মিডিয়া						
৯		২০২৪ সালের অভ্যুত্থান চলাকালে এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের ওপর বেশ কিছু হামলার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। সাংবাদিকদের ওপর হামলা শুধু ভুক্তভোগী ব্যক্তির ওপরই নয়, বরং সমগ্র গণমাধ্যম জগতের ওপরও এক ভীতিকর প্রভাব ফেলে। গণমাধ্যমকর্মীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারহীনতা সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে, স্ব-বিবাচন কে উৎসাহিত করে এবং পেশাদার সাংবাদিকতাকে নিরুৎসাহিত করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও সমন্বয়-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার	সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে শারীরিক ও ডিজিটাল হয়রানি ও আক্রমণ থেকে কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটি আইনি ও কার্যনির্বাহী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার মধ্যে পুলিশ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য গণমাধ্যম পেশাজীবীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এ ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ডের দ্রুত তদন্ত ও বিচার করার সুস্পষ্ট কার্যপ্রণালী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	দণ্ডবিধি ১৮৬০, সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ ২০২৫, সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯২৩, প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ সংশোধন করা	সংসদ, সরকার, পুলিশ	**মত প্রকাশ ও মতামতের স্বাধীনতা** আইসিসিপিআর, ধারা। ১৯: *"প্রত্যেকেরই মত প্রকাশ ও মতামতের স্বাধীনতা আছে।"* সিসিপিআর-এর জিসি ৩৪, অনুচ্ছেদ ১৯ (৩)"২৩। *রাষ্ট্রের পক্ষসমূহের উচিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োগকারীদের কণ্ঠরোধ করার লক্ষ্যে পরিচালিত আক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা [...] এই ধরনের সকল আক্রমণের সময়মতো ও জোরালো তদন্ত করা উচিত, অপরাধীদের বিচার করা উচিত এবং ভুক্তভোগী অথবা হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিদের যথাযথ প্রতিকার নিশ্চিত করা উচিত।"*

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		পাশাপাশি লিঙ্গ-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ প্রতিরোধ, তদন্ত ও বিচার করা উচিত।				
১০		বর্তমান গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থাটি খণ্ডিত, যেখানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (MoIB), বিটিআরসি এবং বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রত্যেকেরই ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও সক্ষমতা সীমিত। এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা কেবল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অসামঞ্জস্যের দিকেই নিয়ে যায় না বরং গণমাধ্যমের দুর্বলতাও বাড়ায় এবং বিধিবিধানের যথেচ্ছ প্রয়োগের সুযোগ করে দেয়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড একটি সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট, প্রয়োগ ক্ষমতা এবং আর্থিক স্বায়ত্তশাসনসহ একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা সমর্থন করে।	একটি স্বাধীন গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থা - জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন - প্রতিষ্ঠা করা, যা সকল প্রকার গণমাধ্যমের (সম্প্রচার, মুদ্রণ ও অনলাইন গণমাধ্যম) তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক, স্বচ্ছ ও মেধা-ভিত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর কমিশনারদের নির্বাচন করবে।	প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ সংশোধন করা	সংসদ, সরকার	**মত প্রকাশ ও মতামতের স্বাধীনতা** আইসিসিপিআর ধারা ১৯: *“প্রত্যেকেরই কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই মতামত পোষণ করার অধিকার থাকতে হবে। ২. প্রত্যেকেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার থাকবে; এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে - সীমানা নির্বিশেষে সব ধরনের তথ্য ও ধারণা অনুসন্ধান করার, গ্রহণ করার এবং আদান-প্রদান করার স্বাধীনতা […] ।”* গণমাধ্যম ও নির্বাচন বিষয়ে জাতিসংঘ, ওএসসিই, ওএএস, এসিএইচপিআর-এর যৌথ বিবৃতি, ১৫ মে ২০০৯: *“একটি বহুত্ববাদী গণমাধ্যম খাত যাতে বিকশিত হতে পারে, এমন পরিবেশ তৈরির জন্য রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন পদক্ষেপ […] গ্রহণ করা উচিত।”*
সামাজিক মাধ্যম এবং ডিজিটাল অধিকার						

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
১১		অপতথ্যের সমন্বিত বিস্তার, বিদ্বেষপূর্ণ এআই-সৃষ্ট বিষয়বস্তু এবং সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে সংগঠিত ঘৃণামূলক বক্তব্য দ্বারা অনলাইন পরিবেশ দূষিত ছিল। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বর্ধিত সক্ষমতা এবং আন্তঃবিভাগীয় পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন, যার মধ্যে দেশব্যাপী গণমাধ্যম সাক্ষরতা ও তথ্য যাচাই উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে, নির্বাচনসহ বৃহৎ পরিসরে জনসাধারণের সহনশীলতা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ম্যান্ডেট, উপকরণ এবং কারিগরি সক্ষমতার অভাব রয়েছে।	তথ্য দূষণ এবং সমন্বিত অপতথ্যের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা জোরদার করার জন্য একটি ব্যাপক কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ, তথ্য যাচাইকারী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন, বেসামরিক নেতৃত্বাধীন কৌশলগত যোগাযোগ ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিবেদিত নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলোর মধ্যে ফলপ্রসূ সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা।	কোনো আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই	সংসদ, সরকার, শিক্ষাজগৎ, সিএসও	**মত প্রকাশ ও মতামতের স্বাধীনতা** আইসিসিপিআর, ধারা ১৯: “*প্রত্যেকেরই মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার থাকবে […]*” সিসিপিআর-এর জিসি ২৫, অনুচ্ছেদ ১৯: “ভোটারদের কোনো প্রকার সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকি, জবরদস্তি, প্রলোভন বা কারসাজিমূলক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে মতামত গঠন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।” মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং "ভুয়া সংবাদ", অপতথ্য ও প্রোপাগান্ডা বিষয়ক যৌথ ঘোষণাপত্র, ইউএন/ওএসসিই/ওএএস/এসিএইচপিআর-এর বিশেষ দূতগণ, ২০১৭। “*অপতথ্য ও অপপ্রচারের প্রভাব সম্পর্কে আরো ভালো বোঝাপড়া তৈরির লক্ষ্যে মধ্যবর্তী বিভিন্ন পক্ষ, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ এবং শিক্ষাবিদসহ সকল অংশীজনকে অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা উচিত।*”
১২		সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সাথে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক কাঠামোর	**অগ্রাধিকার** তথ্যগত ও নির্বাচনী সততা রক্ষার	সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ ২০২৫	সংসদ, জাতীয় সাইবার	**মত প্রকাশ ও মতামতের স্বাধীনতা** সিসিপিআর-এর জিসি ৩৪, অনুচ্ছেদ

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		বর্তমান সমন্বয় প্রক্রিয়াটি মূলত আপত্তিকর বিষয়বস্তু অপসারণের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। নির্বাচন চলাকালীন ক্ষতিকর বিষয়বস্তু মোকাবেলায় এই পদ্ধতির প্রভাব সীমিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্ল্যাটফর্মগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মূলত পরিস্থিতিনির্ভর। শুধুমাত্র অপসারণ আদেশই সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্থানীয় অংশীদারিত্ব বা স্বচ্ছতা প্রতিবেদনে বিনিয়োগ করার জন্য কোনো কাঠামোগত প্রণোদনা তৈরি করে না।	লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক আইনি বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ সংশোধন করে একটি অধিকতর নিরাপদ ও স্বচ্ছ ডিজিটাল পরিসরকে উৎসাহিত করা। *বর্ণিত দায়বদ্ধতাগুলো সুনির্দিষ্ট সহযোগিতা কাঠামো, নির্বাচন কেন্দ্রিক বিশেষ পদক্ষেপ, অ্যালগরিদমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং বিষয়বস্তু পরিমার্জন সংক্রান্ত নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।*	সংশোধন করা	নিরাপত্তা সংস্থা	৭: *“মত প্রকাশ ও মতামতের স্বাধীনতাকে সম্মান করার বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রের প্রতিটি পক্ষের ওপর সামগ্রিকভাবে বাধ্যতামূলক। এই বাধ্যবাধকতার আওতায় রাষ্ট্রীয় পক্ষগুলোকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, লোকজন যেন কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার এমন কোনো কার্যকলাপ থেকে সুরক্ষিত থাকে যা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে [...] ।”* মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং "ভুয়া খবর", অপতথ্য ও প্রোপাগান্ডা বিষয়ক যৌথ ঘোষণাপত্র, ইউএন/ওএসসিই/ওএএস/এসিএইচপিআর-এর বিশেষ দূতগণ, ২০১৭।” *মধ্যবর্তী পক্ষসমূহের উচিত অপতথ্য ও প্রোপাগান্ডা মোকাবিলায় উপযুক্ত প্রযুক্তিগত সমাধানের বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা করা, যা ব্যবহারকারীরা স্বেচ্ছায় প্রয়োগ করতে পারবে। ব্যবহারকারীদের তথ্য যাচাই পরিষেবা প্রদানকারী উদ্যোগগুলোর সাথে তাদের সহযোগিতা করা উচিত এবং তাদের বিজ্ঞাপন মডেলগুলো পর্যালোচনা করে নিশ্চিত করা উচিত যে, সেগুলো যেন মতামত ও ধারণার*

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
						বৈচিত্র্যকে বিরূপভাবে প্রভাবিত না করে।”
নারীদের অংশগ্রহণ						
১৩		সরাসরি নির্বাচনে ৩০০টি আসনের জন্য মোট প্রার্থীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল চার শতাংশের কিছু কম। প্রধান দলগুলো খুব কম সংখ্যক নারীকে মনোনয়ন দিয়েছে; বিএনপি থেকে দশজন, এনসিপি থেকে দুজন এবং জামায়াতে ইসলামী সহ প্রতিদ্বন্দ্বী ৫১টি দলের মধ্যে ৩০টি দল থেকে কাউকেই দেয়নি। সরাসরি নির্বাচনে সাতজন নারী নির্বাচিত হয়েছেন, যা মোট ৩০০টি আসনের মাত্র ২.৩ শতাংশ। আরপিও-এর বিধান অনুযায়ী, একটি রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল কমিটির পদের অন্তত ৩৩ শতাংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার লক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। এই পদক্ষেপটি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নারীদের ক্ষমতায়নে ব্যাপক সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।	**অগ্রাধিকার** ২০৩০ সালের মধ্যে সকল রাজনৈতিক দল যেন সকল অভ্যন্তরীণ দলীয় কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার লক্ষ্য অর্জন করে তা নিশ্চিত করার জন্য, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)-এর ধারা ৯০খ(১)(খ)(ii) বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে আরপিও সংশোধন করা; এবং জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলকে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিতে বাধ্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা।	জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করা	সংসদ	**রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে নারীর অংশগ্রহণ / নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা।** সিইডিএডব্লিউ ধারা ৪.১: “*পুরুষ ও নারীর মধ্যে বাস্তব সমতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পক্ষসমূহ কর্তৃক গৃহীত অস্থায়ী বিশেষ ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক বলে গণ্য হবে না।”* সিইডিএডব্লিউ-এর জিসি ৪০: ৪৫ “কমিটি সুপারিশ করে যে রাষ্ট্রীয় পক্ষসমূহ: ১(ক) উদাহরণস্বরূপ, *সমতা আইন গ্রহণ বা শক্তিশালী করবে, নির্বাচনে নারী ও পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়ে, উল্লম্ব ও অনুভূমিক সমতা তালিকার মাধ্যমে এবং অ-সম্মত তালিকা প্রত্যাখ্যান করে; (খ) নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী নেই বা যোগ্য নন—এই অজুহাত প্রত্যাখ্যান করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।”*

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ						
১৪		জনসংখ্যার প্রায় আট শতাংশ হিন্দু, অপরদিকে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্যরা এক শতাংশের কম। আদিবাসী জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ। সংসদে এই সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কম, কারণ তারা মোট ৩০০টি সরাসরি নির্বাচিত আসনের মধ্যে সামগ্রিকভাবে মাত্র চারটি আসন (এক শতাংশের সামান্য বেশি) পেয়েছে, যা গত সংসদের প্রায় ছয় শতাংশ থেকে অনেক কম। সংসদে সংখ্যালঘুদের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন নেই।	সংসদের একটি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য (যুক্তিসঙ্গত আসন সংখ্যা অতিক্রম করলে) উচ্চকক্ষে তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে লোক মনোনীত করার একটি আবশ্যকতা প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা।	উচ্চকক্ষ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ আইনে অন্তর্ভুক্তির জন্য	সংসদ	**রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের এবং সরকারি পদ ধারণের অধিকার/বৈষম্য থেকে মুক্তি** আইসিসিপিআর, ধারা ২৬: “*আইনের দৃষ্টিতে সকল ব্যক্তি সমান এবং কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়াই আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। এই ক্ষেত্রে, আইন সকল ব্যক্তিকে বর্ণের মতো যেকোনো কারণে সৃষ্ট বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমান ও কার্যকর সুরক্ষা [...] নিশ্চিত করবে*” সিইআরডি, ধারা ৫: “*[...] রাষ্ট্রীয় পক্ষসমূহ সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধ ও নির্মূল করতে এবং সকলের অধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, [...] আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার, বিশেষত (গ) রাজনৈতিক অধিকার, বিশেষত সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার – ভোট দেওয়া এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার [...]*”
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ						
১৫		প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের ভোটাধিকার	সংসদের একটি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার	উচ্চকক্ষ	সংসদ	**রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের**

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		প্রয়োগ করতে পারলেও, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ (সিআরপিডি) অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। প্রতিবন্ধী সম্প্রদায় থেকে কেউ সংসদে নির্বাচিত হননি। বাংলাদেশ ২০০৭ সাল থেকে সিআরপিডি-এর একটি সদস্য এবং ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন গৃহীত হয়। যদিও এই আইনটি গুরুত্বপূর্ণ, তবে সংবিধান ও আইন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীত্বের কারণে বৈষম্যকে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই।	সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য (যুক্তিসঙ্গত আসন সংখ্যা অতিক্রম করলে) উচ্চকক্ষে তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে লোক মনোনীত করার একটি আবশ্যকতা প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা।	সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ আইনে অন্তর্ভুক্তির জন্য		**এবং সরকারি পদ ধারণের অধিকার ও সুযোগ/বৈষম্য থেকে মুক্তি** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ: অনুচ্ছেদ ২৯ “*রাষ্ট্রীয় পক্ষসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অধিকার এবং অন্যদের সাথে সমানভাবে তা ভোগ করার সুযোগ নিশ্চিত করবে এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হবে:* *(ক) এটা নিশ্চিত করা যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অন্যদের সাথে সমানভিত্তিতে, সরাসরি অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, রাজনৈতিক ও জনজীবনে কার্যকরভাবে এবং পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে, যার মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোট দেওয়ার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ও সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে...*”
নির্বাচনী ন্যায়বিচার						
16		যদিও আবেদন ও আপিল দাখিল এবং নিষ্পত্তির জন্য বিধিবদ্ধ সময়সীমার অনুপস্থিতি নির্বাচনী প্রতিযোগী, ইসি এবং ভোটার সকলের মধ্যেই অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল, হাইকোর্ট	কার্যকর প্রতিকারের অধিকার সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে, মনোনয়ন-সংক্রান্ত আবেদনপত্র নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত ও বাস্তবসম্মত সময়সীমা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে	জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করা	সংসদ	**কার্যকর প্রতিকারের অধিকার** আইসিসিপিআর, ধারা ২(৩)(ক): “*এটি নিশ্চিত করা যে, এই সনদে স্বীকৃত কোনো ব্যক্তির অধিকার বা*

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		বিভাগ এবং আপিল বিভাগ উভয়ই মূলত ইসির সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে এবং এই বিষয়ে জোর দিয়েছে যে, প্রার্থীর অযোগ্যতা সংক্রান্ত বিরোধের জন্য নির্বাচন-পরবর্তী ট্রাইব্যুনালই উপযুক্ত বিচারালয়। যদিও আইনি কাঠামো বিচারিক প্রতিকারের একটি সুস্পষ্ট পথ প্রদান করে, তবে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকার্য সমাপ্ত করার জন্য ছয় মাসের অ-বাধ্যতামূলক সময়সীমা এবং আপিল বিভাগের সিদ্ধান্তের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকায়, স্বভাবতই সময়-সংবেদনশীল নির্বাচনী বিরোধগুলোর সময়োচিত নিষ্পত্তি ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।	আরপিও সংশোধন করা উচিত, যাতে প্রচারণা শুরুর আগে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে নির্বাচনের দিনের আগেই এর সমাধান নিশ্চিত করা যায়; নির্বাচন-পরবর্তী আবেদনপত্রের সিদ্ধান্তের জন্যও দ্রুত ও বাধ্যতামূলক সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিত।			*স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হলে তিনি যেন কার্যকর প্রতিকার পান; এমনকি যদি বর্ণিত লঙ্ঘন সরকারি দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমেও ঘটে থাকে।”*
17		তাদের ব্যাপক ম্যান্ডেট থাকা সত্ত্বেও, ইইএসি-সমূহ উল্লেখযোগ্য আর্থিক ও লজিস্টিক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিল। পরিবহনের জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তা ও পুলিশের উপর তাদের নির্ভরতা, প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে সরেজমিন পরিদর্শন পরিচালনার ক্ষমতাকে সীমিত করেছিল এবং মাঝে মাঝে তাদের কার্যকারিতাকেও ক্ষুণ্ন করেছিল। আরও সাধারণভাবে, অর্থায়ন ও পরিচালন	নির্বাচন তদন্ত ও বিচার কমিটিগুলো (ইইএসি) কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য, অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, ধারাবাহিকতা ও আস্থা বাড়ানোর লক্ষ্যে সকল অভিযোগের সিদ্ধান্ত সময়মতো উপলভ্য করার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ বরাদ্দ করা।	কোনো আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই	নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট	**কার্যকর প্রতিকারের অধিকার** **তথ্য প্রাপ্তি** আইসিসিপিআর, ধারা ২(৩)(ক): “*এটি নিশ্চিত করা যে, এই সনদে স্বীকৃত কোনো ব্যক্তির অধিকার বা স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হলে তিনি যেন কার্যকর প্রতিকার পান; এমনকি যদি বর্ণিত লঙ্ঘন সরকারি দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমেও ঘটে থাকে।”* *সিসিপিআর-এর জিসি ৩১, অনুচ্ছেদ*

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		সহায়তার জন্য সরকারি বরাদ্দের উপর নির্ভরতা, অভিযোগকৃত লঙ্ঘনসমূহের বিষয়ে দ্রুত ও জোরালো তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা হ্রাস করেছিল।				১৫: “*মানুষের জন্য সহজলভ্য ও কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করতে [...] স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থার মাধ্যমে লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো দ্রুত, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও কার্যকরভাবে তদন্ত করার সাধারণ বাধ্যবাধকতা কার্যকর করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রয়োজন।*” সিসিপিআর-এর জিসি ৩৪, অনুচ্ছেদ ১৯: “*তথ্য প্রাপ্তির অধিকার কার্যকর করার জন্য, রাষ্ট্রীয় পক্ষসমূহের উচিত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সরকারি তথ্য স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা।*”
ভোট গণনা এবং ফলাফল বিন্যাসকরণ ও সংকলন প্রক্রিয়া						
১৮		সামগ্রিকভাবে ব্যালট গণনা দক্ষতার সাথেই পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু এতে প্রায়শই প্রয়োজনীয় ধারাবাহিকতা এবং পদ্ধতিগত শৃঙ্খলার অভাব ছিল। ব্যালট বাক্স খোলার আগে কত সংখ্যক ভোট সংগৃহীত হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিকভাবে নিরূপণ করা হয়নি। একই সাথে বাছাই ও গণনা করা হচ্ছিল, যা স্বচ্ছতা ব্যাহত করেছিল এবং পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের জন্য প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করা আরও কঠিন	ব্যালট গণনা প্রক্রিয়া পুনঃমূল্যায়নপূর্বক এর শুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাসমূহ সুদৃঢ় করা আবশ্যক; যাতে স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় থাকে। এর আওতায় প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা যাচাই, গণনার পূর্বে ব্যালট পৃথকীকরণ, গণনা চলাকালে পুনঃযাচাই পদ্ধতি এবং ব্যালট পেপারের সামগ্রিক হিসাবের চূড়ান্ত সমন্বয় নিশ্চিত করতে	কোনো আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই নির্বাচন কর্মীদের প্রতি ইসির নির্দেশনা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।	নির্বাচন কমিশন	**অধিকারসমূহ কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে** সিসিপিআর-এর জিসি ২৫, অনুচ্ছেদ ২০: “*ভোটদান ও গণনা প্রক্রিয়ার ওপর স্বাধীন তদারকি থাকা উচিত [...] যাতে ব্যালট পেপারের নিরাপত্তা ও ভোট গণনার বিষয়ে জনমনে পূর্ণ আস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে।*” আইপিইউ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		করে তুলেছিল। ইইউ ইওএম পর্যবেক্ষণের এক-পঞ্চমাংশ ক্ষেত্রে, একজন গণনাকারী কর্তৃক গণনা ও বান্ডেল করা ভোট অন্য কাউকে দ্বারা পুনরায় যাচাই করা হয়নি। এই কারণগুলোর ফলে ইইউ ইওএম পর্যবেক্ষকরা এক-পঞ্চমাংশ পর্যবেক্ষণে ব্যালট গণনার নির্ভুলতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।	হবে।			মানদণ্ড বিষয়ক ঘোষণাপত্র, অনুচ্ছেদ। ৪(৬): “*রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যে, ভোটগ্রহণ যেন জালিয়াতি বা অন্য কোনো অবৈধ কার্যক্রম এড়িয়ে পরিচালিত হয়, প্রক্রিয়াটির নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা বজায় থাকে এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ এবং/অথবা নিরপেক্ষ যাচাই সাপেক্ষে ভোট গণনা করা হয়।*”
১৯		ফলাফল সংকলন ও সারণীকরণ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে কতিপয় কেন্দ্রে অধিকতর স্বচ্ছ তথ্যভুক্তি (ডেটা এন্ট্রি) প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, যেখানে বড় পর্দায় কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ নির্বাচনী এলাকার ফলাফলের নিয়মিত হালনাগাদ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ইসির জন্য সারা দেশের ফলাফলের তথ্য(ডেটা) প্রকাশ করা আইনত বাধ্যতামূলক নয়। নির্বাচনের রাতেই বেশিরভাগ রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রাথমিক নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করেছেন এবং তা দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করার পরেই নির্বাচন কমিশন ফলাফল	**অগ্রাধিকার** উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ভোট গণনার সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যেমন স্ক্রিনে ডেটা এন্ট্রি প্রদর্শন, এবং সম্পূর্ণ প্রাথমিক ও চূড়ান্ত নির্বাচনী ফলাফল অনলাইনেসহ দ্রুত প্রকাশ করা।	কোনো আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই; ইসির দায়িত্ব আরও সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরপিও সংশোধন করা যেতে পারে।	নির্বাচন কমিশন	**অধিকারসমূহ কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে** সিসিপিআর-এর জিসি ২৫, অনুচ্ছেদ ২০: “*ভোটদান ও গণনা প্রক্রিয়ার ওপর স্বাধীন তদারকি থাকা উচিত [...] যাতে ব্যালট পেপারের নিরাপত্তা ও ভোট গণনার বিষয়ে জনমনে পূর্ণ আস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে।*” আইপিইউ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড বিষয়ক ঘোষণাপত্র, অনুচ্ছেদ। ৪(৬): “*রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যে, ভোটগ্রহণ যেন জালিয়াতি বা অন্য কোনো অবৈধ কার্যক্রম এড়িয়ে পরিচালিত হয়, প্রক্রিয়াটির নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা*

নং	এফ আর পৃষ্ঠা	প্রসঙ্গ	সুপারিশ	আইনি কাঠামোতে প্রস্তাবিত পরিবর্তন	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নীতি / প্রতিশ্রুতি
		ঘোষণা শুরু করে এবং এরপর একটি নোটিশ বোর্ডে তার মুদ্রিত কপি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হয়নি। ১৩ ফেব্রুয়ারি ইসি প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার বিজয়ীদের নামসহ একটি আনুষ্ঠানিক গেজেট প্রকাশ করে, তবে এতে ফলাফলের তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইসি কর্তৃক সকল নির্বাচনী এলাকা থেকে ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য(ডেটা) প্রকাশ না করার ফলে স্বচ্ছতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।				*বজায় থাকে এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ এবং/অথবা নিরপেক্ষ যাচাই সাপেক্ষে ভোট গণনা করা হয়।”*